4th Sem

XXVII

BRITISH POLICIES AND ADMINISTRATION IN INDIA

27.1 Emergence of a Colonial Structure of Government
27.2 Causes of creation of Civil Service
27.3 The Army
27.4 The Judicial System
27.5 The Occupation
27.6 The Changing Structure of Indian Economy
27.7 De-industrialisation
27.8 Land Revenue Experiments and its Results
27.9 Economic Impact of the First World War in India
27.10 Social and Cultural Policy of the British : Modern Education

27.1 ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক কাঠামোর প্রবর্তন (Emergence of a Colonial Structure of Government)

সূচনা : ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানি লাভের পর থেকে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্রমশ একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথমদিকে ভারতীয় কর্মচারীদের দ্বারা তার অধিকৃত অঞ্চল শাসনকার্য পরিচালনা করত। এর ফলে অনেক সময় নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হত। তাছাড়া দেশীয় কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থায় কোম্পানির সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটায় কালক্রমে কোম্পানি সমগ্র শাসন ব্যবস্থা নিজের হাতে গ্রহণ করে। তাছাড়া সব থেকে বেশি প্রয়োজন ছিল কোম্পানির অঞ্চলগুলিতে কোম্পানির শাসনের স্থায়িত্ব বিধান করা। ইংরেজ কোম্পানি স্থানীয় অভিজ্ঞতা ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আইনকে ভিত্তি করে যে শাসন কাঠামো গড়ে তুলেছিল তাতে ইংরেজদের ঔপনিবেশিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো গড়ে উঠেছিল। ডঃ বিপানচন্দ্র বলেছেন যে, "ভারতে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা তিনটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল—সিভিল সার্ভিস, সামরিক বাহিনী ও পুলিশ" (The British administration in India was leased on three pillars : The Civil Service, the Army and the Police)। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় কোম্পানি সিভিল সার্ভিস, সামরিক ও পুলিশ ব্যবস্থা এবং বিচার ব্যবস্থার ওপর সর্বপ্রথম নজর দিয়েছিল।

27.2 সিভিল সার্ভিস গড়ে ওঠার কারণ (Causes of creation of Civil Service)

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের পূর্বে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য রাইটার (Writer), ফ্যাক্টর (Factor), অ্যাপ্রেন্টিস (Apprentice) প্রমুখ কর্মচারীরা নিযুক্ত ছিল। কোম্পানির কর্মচারীরা এদেশে ব্যক্তিগত বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন—একথা কোম্পানির কর্তৃপক্ষের অজানা ছিল না। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পর এইসব কর্মচারীদের ওপর প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পিত হলে এরা একই সঙ্গে বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালনা করতে থাকেন। এই সময় থেকেই কোম্পানির কর্মচারীরা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে ওঠে। রবার্ট ক্লাইভ ও লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস কোম্পানির কর্মচারীদের দুর্নীতি রোধ করতে কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। ভারতে কোম্পানি অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে প্রশাসনিক পরিচালনার জন্য অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করতে হয়েছিল। উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্মচারীদের ইংরাজিতে 'সিভিল সারভেন্ট' (Civil Servent) বলা হত। ক্রমে এই সিভিল সারভেন্টরা ভারতের ব্রিটিশ শাসনের প্রধান স্তম্ভে পরিণত হয়।

প্রশাসনিক দুর্নীতি রোধের ব্যবস্থা : ভারতে সিভিল সার্ভিস-এর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন লর্ড কর্ণওয়ালিশ। তিনি কোম্পানির কর্মচারীদের দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য সিভিল সারভেন্টদের বাণিজ্যিক কাজকর্ম বন্ধ করে শুধুমাত্র প্রশাসনিক কর্মেই নিযুক্ত করেছিলেন। কর্নওয়ালিশ প্রশাসনকে দুর্নীতি মুক্ত করার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এই ব্যবস্থা হল—(ক) চাকুরিরত অবস্থায় কোনো উৎকোচ ও রাজস্ব গ্রহণ করা যাবে না, (খ) ব্যক্তিগত ব্যাবসা করতে পারবে না, (গ) কোম্পানির বাণিজ্য ও রাজস্ব বিভাগকে পৃথক করে রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের প্রশাসনিক বিষয়ে দক্ষ করে তোলেন। কর্ণওয়ালিশের সময় থেকে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধায় পৃথিবীর যে-কোনো দেশ অপেক্ষা উন্নত ছিল।

কর্ণওয়ালিশের দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গঠনের প্রতিষ্ঠান : কর্ণওয়ালিশ সরকারের উচ্চপদগুলিতে ভারতীয়দের নিয়োগ নিষিদ্ধ করেন। ভারতবাসী মাত্রই দুর্নীতিপরায়ণ, তাই ভারতীয়দের কোনো উচ্চপদে নিয়োগ করা হবে না বলে ঘোষণা করা হয়। তবে শুধুমাত্র ভারতীয়রাই দুর্নীতিগ্রস্থ ছিল—একথা সত্য নয়, কারণ কোম্পানির কর্মচারীরা কম দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল না। যাই হোক, কর্ণওয়ালিশের এই মনোভাবের ফলে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চার্টার আইনে বলা হয় যে, বছরে ৫০০ পাউন্ডের বেশি বেতনের চাকুরিতে একমাত্র ইউরোপীয় কর্মচারীরাই নিযুক্ত হবে। বলা বাহুল্য, কর্ণওয়ালিশের এই সিদ্ধান্ত যথাযথ ছিল না। ফলে ভারতীয়দের শ্বেতাঙ্গ শাসকদের দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীরা ভারতীয়দের হীন চোখে দেখত। কর্ণওয়ালিশ ইংরেজ কর্মচারীদের দুর্নীতি রোধ করার জন্য তাদের বেতন বৃদ্ধি করেন।

● **ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও হেইলবেরি কলেজ :** ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে ওয়েলেসলি ভারতের বড়োলাট নিযুক্ত হন। তিনি মনে করতেন যে, এদেশে দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে কোম্পানির উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের ভারতীয় ভাষা, রীতি-নীতি, ঐতিহ্য ইত্যাদি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করা একান্ত অপরিহার্য। এই উদ্দেশ্যে তিনি ইংল্যান্ড থেকে আগত তরুণ সিভিলিয়ানদের ভারতীয় ঐতিহ্য, ভাষা, রীতিনীতি সম্পর্কে শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির পরিচালকগণের আপত্তির ফলে কলেজটি বন্ধ হয়ে যায়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পরিবর্তে ইংল্যান্ডের **হেইলবেরি** নামক স্থানে 'ইস্ট ইন্ডিয়ান কলেজ' স্থাপিত হয়। এই কলেজটি হেইলবেরি কলেজ নামেও পরিচিত। হেইলবেরি কলেজে তরুণ শিক্ষানবিশদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। তবে একথা ঠিক যে, যতদিন পর্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রবর্তন হয়নি ততদিন পর্যন্ত দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিকে সিভিলিয়ান হিসেবে নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে প্রথম ভারতে সিভিলিয়ান নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এই সময় থেকে এর নাম হল ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন প্রথম ভারতীয় যিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

○ **গুরুত্ব :** কোম্পানির শাসনকার্য পরিচালনার জন্য ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের অভিজাত পরিবারের সন্তানরাই ভারতে সিভিল সার্ভিস কর্মচারিদের নিযুক্ত হতেন। ফলে অনেক সময় অযোগ্য ব্যক্তিরাও নিযুক্ত হতেন। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে সনদ আইনে এই ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে স্পষ্টভাবে বলা হয় যে ইংল্যান্ডে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সিভিল সার্ভিস কর্মচারী নিয়োগ করা হবে। এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ইংল্যান্ডে রাজ্যের যে-কোনো প্রজা অংশগ্রহণ করতে পারবে। তবে এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের বয়ঃসীমা অবশ্যই ১৮ থেকে ২৩ এর মধ্যে হতে হবে। ক্রমে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ব্রিটিশ শাসনের ইস্পাত কাঠামোয় পরিণত হয়। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় ব্রিটিশের স্বার্থরক্ষা করাই ছিল সিভিল সার্ভিসের কর্মচারীদের একমাত্র লক্ষ্য।

27.3 সামরিক বাহিনী (The Army)

● **প্রথম ইংরেজ সেনাবাহিনী গঠন :** ভারতের প্রথম মেজর স্টিনজার লরেন্স ভারতীয়দের নিয়ে ইউরোপীয় মডেলে একটি দেশীয় সামরিক বাহিনী গঠন করেন (১৭৫৭ খ্রিঃ)। রবার্ট ক্লাইভ ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ পলাশির যুদ্ধের ঠিক আগেই প্রথম 'বেঙ্গল নেটিভ রেজিমেন্ট' গঠন করেন। ভারতের সাধারণ মানুষের কাছে 'বেঙ্গল নেটিভ রেজিমেন্ট' লাল পল্টন ব

বছর ধরে সমগ্র ভারতে কোম্পানি রাজবিস্তার ক
'সিপাই' নামে পরিচিত ছিল। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ একশো বছর ধরে সমগ্র ভারতে কোম্পানি রাজবিস্তার ক
এই রাজ্যজয়ের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেনাবাহিনীর কাজ ছিল ভারতীয় রাজ্য দখল, বিদেশি আক্র
প্রতিরোধ এবং অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন। কোম্পানির সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সেনাই নিযুক্ত হত বর্তমানের বিহার ও উত্তরপ্র
থেকে। বলা বাহুল্য, সামরিক-বাহিনীর উচ্চ পদগুলিতে ভারতীয়দের নিযুক্ত করা হত না। প্রত্যেক সিপাই বাহিনীর অধিনায়ক প
থাকতেন একজন ব্রিটিশ অফিসার।

সিপাহীদের অসন্তোষ : কোম্পানির অধীনস্থ ভারতীয় সিপাইরা প্রথম থেকেই বৈষম্যের শিকার ছিলেন। যেমন, পদমর্যা ইত্যাদি বিভিন্ন দিক থেকে ভারতীয় সিপাইদের সঙ্গে ইংরেজ সিপাহীদের পার্থক্য ছিল। দেশীয় সৈনিকদের চাকুরিতে কোনো উন্নি সুযোগ ছিল না বললেই চলে। লর্ড কর্ণওয়ালিশের সময় থেকে সামরিক বাহিনী উচ্চপদগুলিতে ভারতীয় নিয়োগ বন্ধ করে দেয় হয়। ভারতীয়দের পক্ষে সর্বোচ্চ পদ ছিল সুবাদার। তবে এই সুবাদারের সংখ্যাও ছিল খুবই কম। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি অধীনস্থ সেনাবিভাগে মাত্র তিনজন ভারতীয় ছিলেন যারা ৩০০ টাকার বেশি বেতন পেতেন। বলা বাহুল্য, এই বৈষম্য ভারতী সিপাহীদের অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। যার ফলে কোনো কোনো সময় বিচ্ছিন্নভাবে সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। তা সত্ত্ব কোম্পানির রাজ্যজয়ের ক্ষেত্রে এই ভারতীয় সেনাদলের উপরেই নির্ভর করতে হয়েছিল। স্বল্প সংখ্যক ইংরেজ অধিকাংশ ভারতী সেনাদের নিয়ে গঠিত সামরিক বাহিনীর সাহায্যে এদেশে তাঁদের আধিপত্য বজায় রাখতে পেরেছিল মূলত দুটি কারণে—(i) ভারতী সৈনিকদের জাতীয়তাবাদী চেতনার অভাব। তাই অযোধ্যা থেকে নিযুক্ত কোনো সিপাইয়ের চিন্তাধারায় এমন বিকাশ ঘটে ইংরেজদের পক্ষ নিয়ে মারাঠাদের দমন করার অর্থ হল—ভারতীয়দের বিরোধিতা করা। দেশীয় সৈনিকরা ভাবতেই পারেনি য় কোম্পানিকে সাহায্য করে তারা দেশদ্রোহিতা করছে। (ii) ঐতিহ্যগতভাবে সিপাহিরা এই শিক্ষাই লাভ করেছিল যে, যারা বেত দেবে তাদের প্রতি অনুগত থাকতে হবে। বিশ্বস্ততা হল সৈনিকের ধর্ম। এর ব্যতিক্রম ইংরেজ প্রভুর ক্ষেত্রেও হয়নি। কোম্পানি ভারত জয় সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম স্তম্ভ ছিল সিভিল সার্ভিস, দ্বিতীয় স্ত ছিল সামরিক বাহিনী।

পুলিশি ব্যবস্থা (The Police) : ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম স্তম্ভ ছিল সিভিল সার্ভিস, দ্বিতীয় স্তম্ভ ছি সামরিক বাহিনী আর তৃতীয় স্তম্ভ ছিল পুলিশবাহিনী। ঐতিহাসিক বিপানচন্দ্র বলেছেন, "The Third Pillar of British Rule was the police." (ভারতে ব্রিটিশ শাসনের তৃতীয় স্তম্ভ ছিল পুলিশ বিভাগ)। ভারতে আধুনিক পুলিশি ব্যবস্থার জনক ছিলেন লর্ড কর্ণওয়ালিশ। এদেশের প্রচলিত শাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় শাসনকর্তা বা জমিদারগণ নিজ নিজ এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে। লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রথম এই ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনেছিলেন। তিনি স্থানীয় শাসনকর্তা বা জমিদারদের হাত থেকে শান্তি-শৃঙ্খলা দায়িত্ব কেড়ে নিয়েছিলেন এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য পুলিশি ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। ডঃ স্পীয়ার মন্তব্য করেছেন যে, পুলিশ ছিল সেনাবাহিনীর সহকারী এবং পুলিশের প্রধান কাজ ছিল কোম্পানির বিজিত অঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে কোম্পানির বাণিজ্যিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখা। লর্ড কর্ণওয়ালিশ জমিদারদের কাছ থেকে শান্তি-শৃঙ্খলার দায়িত্ব কেড়ে নিয়ে জেলাগুলিকে কয়েকটি থানায় ভাগ করেন এবং প্রত্যেক থানায় শান্তি-শৃঙ্খলার দায়িত্ব কেড়ে নিয়ে জেলাগুলিকে কয়েকটি থানায় ভাগ করেন এবং প্রত্যেক থানায় একজন করে ভারতীয় 'দারোগা' নিযুক্ত করেন। পরবর্তীকালে সমগ্র জেলার পুলিশ বিভাগের সর্বোচ্চ দায়িত্ব অর্পিত হয় 'সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশের' হাতে। বলা বাহুল্য পুলিশ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদে ভারতীয়দের নিয়োগ করা হত না। গ্রামাঞ্চলে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করত চৌকিদারেরা। তবে এই পুলিশবাহিনী জনসাধারণের কাছে বিশেষ গ্রহণীয় ছিল না। সরকারি নির্দেশে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পুলিশি অত্যাচারের ফলে জনগণ এদের খুবই ঘৃণার চোখে দেখত। এর প্রমাণ পাওয়া যায়, পরবর্তীকালে জাতীয় আন্দোলনের সময়ে সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীরা কুখ্যাত উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারীদের হত্যা করে পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলেন। ঔপনিবেশিক শাসনে দেশের অভ্যন্তরে যে-কোনো বিদ্রোহ বিশেষত সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিষয়ে সজাগ থাকাই ছিল পুলিশের প্রধান কাজ। বিশ শতকের পুলিশ বাহিনীকেই ইংরেজ সরকার জাতীয় আন্দোলন দমনের কাজে ব্যবহার করেছিল।

27.4 বিচার ব্যবস্থা (The Judicial System)

ভারতের কোম্পানির শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর কোম্পানির শাসকগণ বিশেষ অসুবিধার মধ্যে পড়েছিলেন। কারণ তাঁরা ভারতীয় রীতিনীতি সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ছিলেন। কোম্পানির শাসনের প্রথম দিকে দেশে পূর্বের আইনকানুনই প্রচলিত ছিল। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানি লাভের পর ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্ণধার রবার্ট ক্লাইভ এদেশে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। দ্বৈত শাসনের ফলে সমগ্র দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হয়। কোম্পানির নিযুক্ত ভারতীয় 'এজেন্ট'দের কুকর্মের ফলে সারাদেশ অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই বিশৃঙ্খলার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশরাজ এদেশে এক নতুন ধরনের বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। বাংলার গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস-এর শাসনকালে এর সূচনা হয়েছিল। ১৭৭২ খ্রিস্টা

হেস্টিংসে সরাসরি ক্ষমতা হাতে নেওয়ার ফলে হিন্দু ও মুসলিম রীতি-নীতি উভয়ই আইনের মর্যাদা লাভ করে। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুসারে কলকাতায় সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয় (১৭৭৪ খ্রিঃ)। স্যার ইলিজা ইম্পে ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। সমস্ত ব্যক্তিকেই আইনের আওতায় নিয়ে আসা ছিল সুপ্রিমকোর্ট গঠনের মূল উদ্দেশ্য। হেস্টংস বিচার ব্যবস্থায় উন্নতির সূচনা করলেও কর্ণওয়ালিশ বিচার ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করেছিলেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিশ অন্যান্য ব্যবস্থার মতো ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন। কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত নতুন বিচার ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ থেকে বিচার ব্যবস্থাকে মুক্ত রাখা। এই উদ্দেশে। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তিত হয় কর্ণওয়ালিশ কোড। এই কোর্ডে দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা আলাদা করার জন্য দু-ধরনের আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রত্যেক জেলায় একজন করে নিযুক্ত জেলা জর্জ দেওয়ানি মামলার বিচার করতেন। জেলা আদালত থেকে প্রাদেশিক আদালত এবং প্রাদেশিক আদালত থেকে নগর দেওয়ানি আদালতে পুনর্বিচারের জন্য আবেদন করা যেত। ফৌজদারি বিচারের জন্য বাংলা প্রেসিডেন্সিকে চারটি বিভাগ বা ডিভিসনে বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেক বিভাগে একটি করে 'কোর্ট অব সারকিট' গঠন করা হয়। সদর নিজামত আদালত ও সদর দেওয়ানি আদালত ছিল সর্বোচ্চ আপিল আদালত। পরবর্তীকালে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড লরেন্স-এর আমলে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে প্রথম হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে সদর নিজামত ও সদর দেওয়ানি আদালতের অস্তিত্ব বিনষ্ট হয়।

কোম্পানির ঔপনিবেশিক শাসনে শুধুমাত্র বিচারালয়ই প্রতিষ্ঠিত হয়নি, আইন-কানুনেরও পরিবর্তন ঘটেছিল। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড মেকলের নেতৃত্বে গঠিত আইন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন ঘোষণা করা হয় (১৮৫৯ এবং ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে)। আইনের শাসন ও আইনের চোখে সবাই সমান এই আদর্শ ভারতে ইংরেজরা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তবে 'আইনের শাসন' এবং 'আইনের চোখে সমতা' এই আদর্শ সবসময়ই যথাযথভাবে পালন করা হয়নি। তাছাড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে আইন-আদালতের সাহায্য নেওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ বিচার ব্যবস্থা ছিল খুবই ব্যয় সাপেক্ষ। লর্ড কর্ণওয়ালিশ বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করার ফলে পরবর্তীকালে বিচার ব্যবস্থা আরও উন্নত হয়েছিল। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সময় বিচার ব্যবস্থা আরও উন্নত হয়েছিল। লর্ড বেন্টিঙ্ক ভারতীয়দের বিচারকের পদে নিয়োগ করে তাদের বেতন, ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। বেন্টিঙ্কের আমলে ভারতীয় দণ্ডবিধি বা পেনাল কোড রচনার উদ্যোগ শুরু হয় এবং পরবর্তীকালে ১৮৫৯ এবং ১৮৬১-তে ঘোষিত হয়। প্রসঙ্গত স্মরণীয় ভারতে আইনের শাসন প্রবর্তিত হলে ও ইউরোপীয়দের বিচারের জন্য পৃথক আদালত ছিল, এমনকী ভারতীয় বিচারকগণ শ্বেতাঙ্গ অপরাধীদের বিচার করতে পারতেন না। তাছাড়া ভারতীয়দের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গদের বিরোধ বাধলে ভারতীয়রা ন্যায় বিচার পেতেন না। যাই হোক, আইনের শাসন ও আইনের চোখে সকলেই সমান এই উচ্চ আদর্শের কথা বলে ঔপনিবেশিক শাসনকর্তাগণ ভারতে স্থায়ী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন।

27.5 বৃত্তি (The Occupation)

● **নতুন পেশার উদ্ভব :** ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ভারতে শুধুমাত্র সিভিল সার্ভিস নয় বিভিন্ন ধরনের পেশা বা বৃত্তির সৃষ্টি হয়েছিল। এই নতুন পেশা বৃত্তির উদ্ভব ঘটেছিল আর্থ-সামাজিক, রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারের ফলে। ভারতের যে সমস্ত অঞ্চলগুলি প্রথমে কোম্পানির শাসনাধীনে এসেছিল, সেই অঞ্চলগুলিতেই এই নতুন পেশা বা বৃত্তির সৃষ্টি হয়েছিল। বলা বাহুল্য, ইংরেজ কোম্পানি সর্বপ্রথম বাংলাতে তাদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল, ফলে বাংলাদেশেই প্রথম নতুন পেশার সৃষ্টি হয়। কোম্পানির অধীনে বাংলাদেশে জমিদারি প্রথা, জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে সমাজে জমিদার ও প্রজা শ্রেণির সৃষ্টি হয়। এই সময় বোম্বাইতে বস্ত্র কারখানা ও কলকাতায় পাটকল গড়ে উঠলে সমাজে মালিক ও শ্রমিক শ্রেণির সৃষ্টি হয়। কর্ণওয়ালিশ এদেশে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তন করার ফলে জমি সংক্রান্ত বিরোধ বৃদ্ধি পায়। এই বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য উকিল, জর্জ, কেরানি, মুহুরি, মোক্তার ইত্যাদি নতুন পেশার সৃষ্টি হয়। বাণিজ্য কেন্দ্র, কোর্ট কাছারিকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন শহর গড়ে উঠতে থাকে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এই শহরগুলি ক্রমে শিক্ষা, আইন, চিকিৎসা, বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। গ্রাম থেকে মানুষ নানান সুযোগ-সুবিধার আশায় শহরে এসে বসবাস করতে শুরু করে। ফলে শহরে নতুন নতুন পেশা বা বৃত্তির সৃষ্টি হয়। শিক্ষক, অধ্যাপক, ছোটো দোকানদার, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, সাংবাদিক ইত্যাদি নানা পেশাগত শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। কোম্পানির শাসনাধীনে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটে। তবে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে খ্রিস্টান মিশনারিদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ভাষার ব্যবধান ঘুচিয়ে ভারতীয়দের খ্রিস্টধর্মের প্রতি অনুরাগী করে তোলার উদ্দেশ্যে মিশনারিরা এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটান। এর ফলে সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় পরবর্তীকালে ভারতের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কোম্পানির শাসনকালে শিল্পের উন্নতি ঘটার ফলে সমাজে পুঁজিপতি শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এই পুঁজিপতি শ্রেণির বিপরীতে সমাজে পুঁজিহীন শ্রেণিরও উদ্ভব ঘটেছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারতে নতুন নতুন ধরনের পেশা বা বৃত্তির সৃষ্টি হয়েছিল—একথা অস্বীকার করা যায় না।

হেস্টিংসে সরাসরি ক্ষমতা হাতে নেওয়ার ফলে হিন্দু ও মুসলিম রীতি-নীতি উভয়ই আইনের মর্যাদা লাভ করে। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুসারে কলকাতায় সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয় (১৭৭৪ খ্রিঃ)। স্যার ইলিজা ইম্পে ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। সমস্ত ব্যক্তিকেই আইনের আওতায় নিয়ে আসা ছিল সুপ্রিমকোর্ট গঠনের মূল উদ্দেশ্য। হেস্টংস বিচার ব্যবস্থায় উন্নতির সূচনা করলেও কর্ণওয়ালিশ বিচার ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করেছিলেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিশ অন্যান্য ব্যবস্থার মতো ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করেন। কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত নতুন বিচার ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ থেকে বিচার ব্যবস্থাকে মুক্ত রাখা। এই উদ্দেশে। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তিত হয় কর্ণওয়ালিশ কোড। এই কোর্ডে দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা আলাদা করার জন্য দু-ধরনের আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রত্যেক জেলায় একজন করে নিযুক্ত জেলা জর্জ দেওয়ানি মামলার বিচার করতেন। জেলা আদালত থেকে প্রাদেশিক আদালত এবং প্রাদেশিক আদালত থেকে নগর দেওয়ানি আদালতে পুনর্বিচারের জন্য আবেদন করা যেত। ফৌজদারি বিচারের জন্য বাংলা প্রেসিডেন্সিকে চারটি বিভাগ বা ডিভিসনে বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেক বিভাগে একটি করে 'কোর্ট অব সারকিট' গঠন করা হয়। সদর নিজামত আদালত ও সদর দেওয়ানি আদালত ছিল সর্বোচ্চ আপিল আদালত। পরবর্তীকালে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড লরেন্স-এর আমলে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে প্রথম হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে সদর নিজামত ও সদর দেওয়ানি আদালতের অস্তিত্ব বিনষ্ট হয়।

কোম্পানির ঔপনিবেশিক শাসনে শুধুমাত্র বিচারালয়ই প্রতিষ্ঠিত হয়নি, আইন-কানুনেরও পরিবর্তন ঘটেছিল। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড মেকলের নেতৃত্বে গঠিত আইন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন ঘোষণা করা হয় (১৮৫৯ এবং ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে)। আইনের শাসন ও আইনের চোখে সবাই সমান এই আদর্শ ভারতে ইংরেজরা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তবে 'আইনের শাসন' এবং 'আইনের চোখে সমতা' এই আদর্শ সবসময়ই যথাযথভাবে পালন করা হয়নি। তাছাড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে আইন-আদালতের সাহায্য নেওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ বিচার ব্যবস্থা ছিল খুবই ব্যয় সাপেক্ষ। লর্ড কর্ণওয়ালিশ বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করার ফলে পরবর্তীকালে বিচার ব্যবস্থা আরও উন্নত হয়েছিল। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সময় বিচার ব্যবস্থা আরও উন্নত হয়েছিল। লর্ড বেন্টিঙ্ক ভারতীয়দের বিচারকের পদে নিয়োগ করে তাদের বেতন, ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। বেন্টিঙ্কের আমলে ভারতীয় দণ্ডবিধি বা পেনাল কোড রচনার উদ্যোগ শুরু হয় এবং পরবর্তীকালে ১৮৫৯ এবং ১৮৬১-তে ঘোষিত হয়। প্রসঙ্গত স্মরণীয় ভারতে আইনের শাসন প্রবর্তিত হলে ও ইউরোপীয়দের বিচারের জন্য পৃথক আদালত ছিল, এমনকী ভারতীয় বিচারকগণ শ্বেতাঙ্গ অপরাধীদের বিচার করতে পারতেন না। তাছাড়া ভারতীয়দের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গদের বিরোধ বাধলে ভারতীয়রা ন্যায় বিচার পেতেন না। যাই হোক, আইনের শাসন ও আইনের চোখে সকলেই সমান এই উচ্চ আদর্শের কথা বলে ঔপনিবেশিক শাসনকর্তাগণ ভারতে স্থায়ী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন।

27.5 বৃত্তি (The Occupation)

● **নতুন পেশার উদ্ভব :** ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ভারতে শুধুমাত্র সিভিল সার্ভিস নয় বিভিন্ন ধরনের পেশা বা বৃত্তির সৃষ্টি হয়েছিল। এই নতুন পেশা বৃত্তির উদ্ভব ঘটেছিল আর্থ-সামাজিক, রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসারের ফলে। ভারতের যে সমস্ত অঞ্চলগুলি প্রথমে কোম্পানির শাসনাধীনে এসেছিল, সেই অঞ্চলগুলিতেই এই নতুন পেশা বা বৃত্তির সৃষ্টি হয়েছিল। বলা বাহুল্য, ইংরেজ কোম্পানি সর্বপ্রথম বাংলাতে তাদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল, ফলে বাংলাদেশেই প্রথম নতুন পেশার সৃষ্টি হয়। কোম্পানির অধীনে বাংলাদেশে জমিদারি প্রথা, জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে সমাজে জমিদার ও প্রজা শ্রেণির সৃষ্টি হয়। এই সময় বোম্বাইতে বস্ত্র কারখানা ও কলকাতায় পাটকল গড়ে উঠলে সমাজে মালিক ও শ্রমিক শ্রেণির সৃষ্টি হয়। কর্ণওয়ালিশ এদেশে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার ক্ষেত্রে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তন করার ফলে জমি সংক্রান্ত বিরোধ বৃদ্ধি পায়। এই বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য উকিল, জর্জ, কেরানি, মুহুরি, মোক্তার ইত্যাদি নতুন পেশার সৃষ্টি হয়। বাণিজ্য কেন্দ্র, কোর্ট কাছারিকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন শহর গড়ে উঠতে থাকে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে এই শহরগুলি ক্রমে শিক্ষা, আইন, চিকিৎসা, বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। গ্রাম থেকে মানুষ নানান সুযোগ-সুবিধার আশায় শহরে এসে বসবাস করতে শুরু করে। ফলে শহরে নতুন নতুন পেশা বা বৃত্তির সৃষ্টি হয়। শিক্ষক, অধ্যাপক, ছোটো দোকানদার, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক, সাংবাদিক ইত্যাদি নানা পেশাগত শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। কোম্পানির শাসনাধীনে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটে। তবে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে খ্রিস্টান মিশনারিদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ভাষার ব্যবধান ঘুচিয়ে ভারতীয়দের খ্রিস্টধর্মের প্রতি অনুরাগী করে তোলার উদ্দেশ্যে মিশনারিরা এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ঘটান। এর ফলে সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় পরবর্তীকালে ভারতের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কোম্পানির শাসনকালে শিল্পের উন্নতি ঘটার ফলে সমাজে পুঁজিপতি শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এই পুঁজিপতি শ্রেণির বিপরীতে সমাজে পুঁজিহীন শ্রেণিরও উদ্ভব ঘটেছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে ভারতে নতুন নতুন ধরনের পেশা বা বৃত্তির সৃষ্টি হয়েছিল—একথা অস্বীকার করা যায় না।

27.6 ভারতীয় অর্থনীতির পরিবর্তিত কাঠামো (The Changing Structure of Indian Economy) :

পলাশির যুদ্ধের পূর্বে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ভারত ছিল এক সমৃদ্ধশালী দেশ। কিন্তু পলাশির যুদ্ধের পর ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের চিরাচরিত অর্থনীতির ভাঙন শুরু হয়। বণিকরূপে আগত [?] ইংরেজ কোম্পানির একমাত্র লক্ষ্য ছিল সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা। পরে এদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের পর শাসকরূপে [?] তারা এদেশের জনগণের কল্যাণের কথা চিন্তা করেনি। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হলেও ইংরেজ কোম্পানি ভারতকে [?] কোনোদিনই নিজেদের দেশ বলে মনে করেনি। ইংরেজরা একমাত্র নিজেদের কোম্পানি ও ইংল্যান্ডের স্বার্থে ভারতের সম্পদ [?] ব্যবহার করতে চেয়েছিল। ফলে ভারতকে শোষণ করে ভারতীয় সম্পদ ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়াই ছিল ইংরেজ শাসকদের একমাত্র [?] উদ্দেশ্য। ঐতিহাসিক ড. বিপানচন্দ্র যথার্থই বলেছেন যে, নিজেদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ব্রিটিশ জাতি ভারতের জন্য এক নতুন [?] ধরনের শাসনব্যবস্থা উদ্ভাবন করে। যতদূর সম্ভব ভারতের অর্থ শুষে নিয়ে ব্রিটিশ স্বার্থে তা কাজে লাগানোই ছিল ব্রিটিশের মূল [?] লক্ষ্য। ইংরেজদের এই স্বার্থপর ঔপনিবেশিক নীতির ফলে ভারতের চরম সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছিল। ভারতের সুপ্রাচীন ও [?] ঐতিহ্যমণ্ডিত কুটির শিল্পের ধ্বংসের সঙ্গে চিরাচরিত ভারতীয় কৃষিব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। ফলে ভারতের গ্রামীণ সমাজ ভেঙে [?] পড়েছিল এবং সমাজের সর্বস্তরে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল।

☐ সম্পদের নির্গমন (Drain of Wealth) :

● **পলাশির লুণ্ঠন** : পলাশির যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার অপরিমিত সম্পদের অধিকারী [?] হয়ে ওঠে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের পর অষ্টাদশ শতক ধরে কোম্পানি এবং তাঁর কর্মচারীরা বাংলার সোনা-রুপা ও সম্পদের যে লুণ্ঠন [?] করে তাকে গবেষক ব্রুকস এ্যাডামস পলাশির লুণ্ঠন বলেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে 'পলাশির লুণ্ঠন' কথাটি সর্বপ্রথম ব্রুকস [?] এ্যাডামসই ব্যবহার করেন। বাংলা থেকে কোম্পানির কর্মচারী এবং ইংরেজ বণিকদের দ্বারা অর্থ ও সম্পদের নির্গমন বা [?] অপহরণকেই 'পলাশির লুণ্ঠন' বলা হয়। বাংলা থেকে সম্পদ নির্গমন হয়েছিল প্রথমত, বেসরকারিভাবে কোম্পানির কর্মচারী ও [?] ইংরেজ বণিকদের দ্বারা এবং দ্বিতীয়ত, কোম্পানির বাণিজ্য, আর্থিক ও রাজস্বনীতির ফলে। সমকালীন ইংরেজ শাসকদের মধ্যে [?] ভেরেলস্ট, ফিলিপ ফ্রান্সিস, ওয়ারেন হেস্টিংস এবং এডমন্ডবার্ক ও পলাশির লুণ্ঠনের অভিযোগ স্বীকার করেছেন।

● **কর্তৃপক্ষ ও কোম্পানির কর্মচারীদের উৎকোচ গ্রহণ** : ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ কোম্পানির দেওয়ানি [?] লাভ পর্যন্ত কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীরা উৎকোচ, উপঢৌকন ও অন্যান্য সূত্রে বাংলার নবাবের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণ [?] অর্থ আদায় করে স্বদেশে পাঠায়। ক্লাইভ সহ কোম্পানির সকল স্তরের কর্মচারীরা এই লুণ্ঠনে অংশগ্রহণ করেছিল। বাংলার নবাব [?] সিরাজ-উদ্-দৌলাকে পরাজিত করার পর বাংলার মসনদে এক নবাবকে সরিয়ে আর এক নবাবকে বসানো অর্থাৎ "নবাব তৈরির [?] ব্যবসায়" নেমে কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগতভাবে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। টম্পসন ও গ্যারাট মন্তব্য করেছেন যে, বাংলা [?] টাকার গাছ নাড়া দিয়ে টাকা কুড়ানো আরম্ভ হয়। ড. পার্সিভ্যাল স্পীয়ার পলাশির পরবর্তী যুগকে "Age of open and unashamed Plunder" (প্রকাশ্য ও নির্লজ্জ লুণ্ঠনের যুগ) বলে অভিহিত করেছেন। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, ক্লাইভ ও [?] কোম্পানির অন্যান্য কর্মচারীরা মিরকাশিমকে মসনদে বসানো জন্য ৩২,১৮,০০০ টাকা লাভ করেছিলেন। মিরজাফরের মৃত্যুর পর [?] (১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ) তাঁর পুত্র নজম-উদ্-দৌলাকে মসনদে বসানোর জন্য কলকাতা কাউন্সিলের কয়েকজন সদস্য ৮২,৫০,০০০ টাকা [?] লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস বেনারসের জমিদার চৈতসিং এবং অযোধ্যার নবাবের কাছ থেকে প্রচুর [?] অর্থ আদায় করেছিলেন।

কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য : পলাশির যুদ্ধের পর ১৭৫৭ থেকে ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানির [?] কর্মচারীরা ব্যক্তিগত অবাধ বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রচুর উপার্জন করে ইংল্যান্ডে পাঠায়। এই অবৈধভাবে বাণিজ্যের জন্য কোম্পানির [?] কর্মচারীরা কোনো প্রকার শুল্ক দিত না। ড. নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ বলেছেন যে, উৎকোচ বা নজরানার মাধ্যমে কোম্পানির কর্মচারী [?] যে অর্থ লাভ করত তার অনেক বেশি অর্থ তারা লাভ করত ব্যক্তিগত বাণিজ্যের মাধ্যমে। তদানীন্তন সময়ে মুর্শিদাবাদে নিযুক্ত [?] ইংরেজ রেসিডেন্ট সাইকস সোরা, লবণ ও রেশমের একচেটিয়া ব্যক্তিগত বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিলেন। ড. [?] নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ ইংরেজ বণিকদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যকে লুণ্ঠন বলে অভিহিত করেছেন।

কমিশনের মাধ্যমে অর্থোপার্জন : উৎকোচ, নজরানা, উপঢৌকন ও ব্যক্তিগত বাণিজ্য ছাড়া কোম্পানির কর্মচারীরা বিভিন্ন [?] প্রকার গোপন ও অবৈধচুক্তি এবং ঠিকাদারির মাধ্যমে প্রচুর অর্থোপার্জন করে দেশে পাঠাত। অবৈধ চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে [?] ওয়ারেন হেস্টিংস-এর তুলনা মেলা ভার। তিনি স্বনামে বেনামে বহু বেআইনি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। পরে তাঁর বিরুদ্ধে [?] ইম্পিচমেন্টের সময় তাঁর বহু কুকীর্তি ফাঁস হয়ে যায়। ওয়ারেন হেস্টিংস ছাড়াও চার্লসগ্রান্ট, চার্লস ক্রফট, সুলিভান প্রমুখ [?] কোম্পানির কর্মচারীগণও এ বিষয়ে পিছিয়ে ছিলেন না। বোর্ড অফ ট্রেডের সদস্যরাও দুর্নীতির মাধ্যমে প্রচুর [?] অর্থ উপার্জন করতেন। এঁরা কোম্পানির মাল কেনার সময় দেশীয় বণিক এমনকি নিঃস্ব অসহায় গরিব তাঁতিদের কাছ থেকে [?] জোর করে কমিশন আদায় করতেন। কার্ল মার্কসের মতে, "এক শিলিং খরচ না করে এঁরা শূন্য থেকে সোনা ফলাত।"

...ইংল্যান্ডের পরিচালক সভা কিছু স্বাধীন

স্বাধীন ইংরেজ ব্যবসায়ীদের অত্যাচার : কোম্পানি ও তার কর্মচারীরা ছাড়াও ইংল্যান্ডের পরিচালক সভা কিছু স্বাধীন বণিককে বাংলায় বাণিজ্য করার জন্য লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র প্রদান করত। এই স্বাধীন ব্যবসায়ীরা ছিল অত্যন্ত লোভী, দুর্নীতিগ্রস্ত। এরা কোম্পানির কোনো নিয়ম মানতেন না। স্বাধীন ব্যবসায়ীরা জোর করে অথবা ভয় দেখিয়ে গরিব তাঁতি, চাষিদের কাছ থে[কে] অত্যন্ত কম দামে জিনিস কিনে বিক্রি করত। বাংলা থেকে কম দামে জিনিস কিনে অত্যন্ত চড়া দামে সেগুলি ইউরোপের বাজারে বিক্রি করে তারা প্রচুর মুনাফা অর্জন করত এবং ইংল্যান্ডে পাঠাত। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ কোম্পানির কর্মচারী বা স্বাধীন ব্যবসায়ীরা বিল অফ এক্সচেঞ্জ (Bill of Exchange)-এর মাধ্যমে স্বদেশে পাঠাত। আবার ক্লাইভ প্রমুখ কোম্পানির কর্তাব্যক্তিগণ এদেশে থেকে হীরা কিনে জাহাজ মারফৎ ইংল্যান্ডে পাঠাত। এছাড়া ফরাসি, দিনেমার, ডাচ প্রভৃতি ইউরোপীয় কোম্পানিগুলিকে তারা বাণিজ্য করার জন্য অর্থ ধার দিত বা এশিয়ার বিভিন্ন ব্রিটিশ বাণিজ্য কেন্দ্র মারফৎ ইংল্যান্ডে অর্থ পাঠাত।

কোম্পানির মাধ্যমে বাংলায় সম্পদের ব্যবহার : ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও বাংলা থেকে ইংল্যান্ডে অর্থ প্রেরণ করত। পলাশির যুদ্ধের পর প্রায় ৪০ বছর কোম্পানি পণ্যদ্রব্য ক্রয় করার জন্য ইংল্যান্ড থেকে কোনো সোনা বা রুপো আনত না। প্রথমত, তারা বাংলায় আদায়কৃত রাজস্ব থেকে পণ্যদ্রব্য কিনত এবং তা উচ্চমূল্যে ইউরোপের বাজারে বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করত। বাংলার রাজস্বকে ইনভেস্টমেন্টে ব্যবহার করে কোম্পানি নিজের তহবিল থেকে অর্থ ব্যয় বন্ধ করে। এইভাবে বাণিজ্যিক লগ্নি বা ইনভেস্টমেন্টের মাধ্যমে বাংলার টাকা বাইরে চলে যেতে থাকে। দ্বিতীয়ত, চিন দেশের সবুজ চা এবং রেশম (সাদা) ইউরোপের বাজারে অত্যন্ত চড়া দামে বিক্রি হত। কোম্পানি স্বদেশ থেকে মূলধন না এনে বাংলার রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত অর্থ চিনে বাণিজ্যে বিনিয়োগ করত। পরে অর্থের পরিবর্তে বাংলা থেকে আফিম প্রেরিত হত এবং আফিমের পরিবর্তে কোম্পানি চিনা চা ও সাদা রেশম ক্রয় করত। তৃতীয়ত, কোম্পানির অংশীদারদের ডিভিডেন্ড, ব্রিটিশ সরকারের প্রাপ্য অর্থ, ভারতের ভারতের প্রশাসনিক ব্যয়, ইংল্যান্ডে 'ইন্ডিয়া অফিস'-এর ব্যয়, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির প্রশাসনিক ব্যয় ও বাণিজ্যিক লগ্নী—সমস্ত কিছুই বাংলার রাজস্ব থেকে মেটানো হত।

চার্টার আইনের ফল (১৮৩১ খ্রিঃ) : ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে চার্টার আইন প্রবর্তিত হলে ভারতের কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার লোপ পায়। এই সময় ইংল্যান্ড থেকে বহু স্বাধীন বণিক ও বাণিজ্য কোম্পানিগুলি ভারতে বাণিজ্য করতে আসে। তাছাড়া এ সময় ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ডের কারখানায় উৎপাদিত উদ্বৃত্ত পণ্যদ্রব্য ভারতে বিক্রির জন্য আসতে থাকে। ইংল্যান্ডের পণ্যদ্রব্য ভারতে বিক্রি করে মুনাফা ইংল্যান্ডে পাঠানো হত। এর ফলে একদিকে যেমন ব্রিটেনের কলকারখানাগুলির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, অন্যদিকে তেমনি ভারতের গ্রামীণ কুটির শিল্পের অবনতি ঘটে এবং ভারত থেকে সম্পদের নিষ্ক্রমণ হতে থাকে।

বাংলা থেকে প্রেরিত সম্পদের পরিমাণ : পলাশির যুদ্ধের পর ভারত থেকে ঠিক কী পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ ইংল্যান্ডে গিয়েছিল তার সঠিক হিসাব জানা সম্ভব নয়। জেমস গ্রান্টের মতে কোম্পানি বছরে ইনভেস্টমেন্টে ১,৮০,০০,০০০ টাকা খরচ করত। ডা জে. সি. সিংহ তাঁর **'Economic Analysis of Bengal'** গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, ১৭৬৯-৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোম্পানি ডিভিডেন্ড ও ব্রিটিশ সরকারের প্রাপ্য বাবদ বাংলা থেকে মোট এক কোটি পাউন্ড ইংল্যান্ডে পাঠিয়েছিল। বাংলা থেকে কত পরিমাণ সম্পদ ইংল্যান্ডে প্রেরিত হয়েছিল তা নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন মত দিয়েছেন। মাদ্রাজের রাজস্ব বোর্ডের সচিব **জন সুলিভান** বলেছেন, ''আমাদের শাসন ব্যবস্থা অনেকটা স্পঞ্জের মতো। গঙ্গার তীরবর্তী দেশ থেকে এই স্পঞ্জধর্মী শাসন যা কিছু সম্পদ সব শুষে নেয় এবং টেমস নদীর তীরবর্তী দেশে এসে তা নিংড়ে দেয়।''

- **সম্পদ নির্গমন তত্ত্বের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি** : বাংলা তথা ভারত থেকে সম্পদের নির্গমন প্রকৃতই ঘটেছিল কি না সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। দাদাভাই নওরোজি, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকের মতে ভারতে দারিদ্র্যের প্রকৃত কারণ হল সম্পদের নির্গমন। অন্যদিকে পি. জে. মার্শাল, থিওডোর মরিসন প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা সম্পদ নির্গমনের তত্ত্ব মানতে রাজি নন। থিওডোর মরিসনের মতে, রপ্তানি বাড়ার ফলে বাংলার আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল, একথা—... নয়। কারণ আমদানি বৃদ্ধি পাবার ফলে একদিকে যেমন বহুলোকের কর্মসংস্থান হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি রেশম, তাঁত, ... শিল্পের প্রসার হয়েছিল। পি. জে. মার্শালের মতে, বাংলা থেকে সম্পদের নির্গমন ঘটলে তা একতরফাভাবে হয়নি। বিনিময়ে বাংলাও অনেকভাবে উপকৃত হয়। পি. জে. মার্শাল, গ্রান্ট প্রমুখ সম্পদ অপহরণ তত্ত্ব মানতে রাজি নন। তাঁদের মতে, কোম্পানি যেমন নিত তেমন প্রশাসনিক ও সামরিক পরিষেবা দিত। রপ্তানির জন্য বাংলার বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতি হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে কোম্পানি যা নিত তার বৃহৎ সামান্য অংশে এদেশের জন্য খরচ করত। সুতরাং, সম্পদ নির্গমন তত্ত্ব একটি বাস্তব ঘটনা। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের মতে, ভারতীয় সম্পদের অপহরণ বা নিষ্ক্রমণ ভারতের দারিদ্র্যের মূল কারণ ছিল।

27.7 শিল্প ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন বা অবশিল্পায়ন (De-industrialisation)

সুদূর অতীত থেকে ভারতের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি ছিল কৃষি ও শিল্প। ভারতের পণ্যসামগ্রী স্থলপথে ও জলপথে ব...

পূর্ব এশিয়া, মধ্য এশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। আরব বণিকেরা গুজরাট ও মালাবার উপকূল থেকে পণ্য নিয়ে পূর্ব আফ্রিকা ও ইউরোপের বাজারে বিক্রি করত। ক্রুসেডের ফলে আরব বণিকদের বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ভারতীয় পণ্যের আকর্ষণে ইউরোপীয়রা ভারতে আসতে থাকে। ভারত থেকে ইউরোপীয় বণিকরা সুতি ও রেশম বস্ত্র, সোরা, চিনি, নীল, আফিম, লবণ, পাটজাত দ্রব্য ইত্যাদি ক্রয় করে ইউরোপের বিভিন্ন বাজারে বিক্রি করত। ইউরোপীয় বণিকরা সোনা, রুপা বা স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে ভারত থেকে এসব জিনিস নিয়ে যেত। ফলে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের আগে ইউরোপের সম্পদ ভারতে সঞ্চিত হত। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পূর্বে বাংলা কৃষি ও শিল্পে খুবই সমৃদ্ধশালী ছিল। বাংলায় যেমন বিভিন্ন শস্য ও ফল প্রচুর ফলত, তেমনি বস্ত্রশিল্পে বাংলা ছিল খুবই সমৃদ্ধ অঞ্চল। বাংলার রেশম ও সুতি বস্ত্রের চাহিদা বেশি থাকায় অসংখ্য তাঁতি বস্ত্র বয়ন করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করত। ইউরোপের বাজারে বাংলার সুতি বস্ত্রের বিশেষ চাহিদা ছিল। তাছাড়া ইউরোপে রেশম বস্ত্র, ঢাকাই মসলিন ইত্যাদির বিশেষ চাহিদা থাকায় বাংলার বস্ত্রশিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছিল।

বাংলার বস্ত্রশিল্পের অবনতি : আঠারো শতকের মধ্যভাগ থেকে অর্থাৎ ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশি যুদ্ধের পর থেকে বাংলার বস্ত্রশিল্পের অবনতির সূচনা হয়। ইংরেজ কোম্পানি ও তার কর্মচারীরা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অপব্যবহার করে বাংলার বস্ত্রশিল্পকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। পলাশির যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ইংরেজরা একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার লাভ করে। তারা বাংলার তাঁতিদের কমদামে এবং দাদনী প্রথায় কাপড় তৈরি করতে বাধ্য করে। এর ফলে অনেক তাঁতি তার জীবিকা ত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ায় বস্ত্রশিল্পের অবনতি ঘটতে থাকে। বস্ত্র তৈরির জন্য তাঁতিরা উচ্চমূল্যে কোম্পানির কাছ থেকে তুলো কিনে আবার কোম্পানির কাছে কাপড় বিক্রি করতে বাধ্য হত। এর ফলে তাঁতিদের লোকসানের সীমা ছিল না। তাঁতিরা নিঃস্ব হয়ে যায়, বস্ত্রশিল্পে মন্দা দেখা দেয়।

● **ইংল্যান্ডের শিল্প-বিপ্লব :** অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লবের ফলে বস্ত্রশিল্পের দ্রুত বিকাশ ঘটে। বস্ত্রশিল্পের বিকাশ ঘটায় ইংল্যান্ডের শিল্পপতিরা ভারতীয় বস্ত্র আমদানির পথে বাধার সৃষ্টি করে। তারা ভারত থেকে বস্ত্র আমদানির পরিবর্তে ইংল্যান্ডে তৈরি বস্ত্র ভারতে রপ্তানি করতে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিল। ইংল্যান্ডে ভারতীয় বস্ত্র নিষিদ্ধ করার জন্য ইংল্যান্ডের বস্ত্রশিল্প ব্যবসায়ীরা সরকারের উপর চাপ দিতে থাকে। শিল্পপতিদের চাপে সরকার ইংল্যান্ডের বাজারে ভারতীয় বস্ত্র বিক্রি নিষিদ্ধ করে। ফলে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য হ্রাস পায়। ইংল্যান্ডের বস্ত্র ব্যবসায়ীরা তাদের কারখানায় তৈরি কাপড় ভারতে পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ইংল্যান্ডের কারখানায় তৈরি কাপড় ভারতে আসতে শুরু করে। ভারতীয় বস্ত্রের তুলনায় বিলাতি বস্ত্র সস্তা ছিল। সস্তা বিলাতি বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাংলার তাঁতিরা হেরে যেতে থাকে। বিলাতি বস্ত্র আমদানির ফলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প তথা বাংলার বস্ত্রশিল্পের অবনতি থাকে। ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, সুরাট প্রভৃতি অঞ্চল একদা বস্ত্রশিল্পের জন্য বিশ্ববিখ্যাত ছিল, তা ক্রমশ মর্যাদা হারিয়ে ফেলে। বিলাতি বস্ত্রের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে ভারতের বস্ত্র-শিল্প ধ্বংস হয়। তবে শুধুমাত্র সুতিবস্ত্রই নয়, রেশম ও পশমজাত দ্রব্যাদি, লোহা, মৃৎশিল্প, অস্ত্রশস্ত্র, কাচ ইত্যাদি বিভিন্ন দেশীয় শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ঔপনিবেশিক শাসনের ভারত ইংল্যান্ডের কারখানাগুলির খোলা বাজার ও কাঁচামাল সরবরাহের উৎসে পরিণত হয়।

● **অবশিল্পায়নের কারণ :** ভারতীয় শিল্পের ধ্বংসের পশ্চাতে কতগুলি কারণ ছিল। **প্রথমত,** ভারতে উৎপাদিত পণ্যের তুলনায় বিদেশি পণ্য (বিশেষত ইংল্যান্ড জাত) অনেক সস্তা ছিল। **দ্বিতীয়ত,** দেশীয় শিল্পের পৃষ্ঠপোষক দেশীয় রাজন্যবর্গ ও অভিজাতদের বিলুপ্তি। **তৃতীয়ত,** উচ্চবৃত্ত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বিদেশি পণ্যের প্রতি ঝোঁক। **চতুর্থত,** ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং ভারতে এর যোগান অব্যাহত থাকে। **পঞ্চমত,** ভারতের বাজারে একচেটিয়া ইংল্যান্ড জাত শিল্পপণ্য বিক্রির প্রবণতা। **ষষ্ঠত,** ব্রিটিশ সরকারের শুল্ক সংরক্ষণ নীতি। **সপ্তমত,** ইংল্যান্ডে শিল্পের প্রয়োজনে ভারত থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করা হত এর ফলে এবং অন্যান্য বিভিন্ন কারণে ভারতীয় শিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। **অষ্টমত,** ভারতের নৌশক্তির দুর্বলতার ফলে ভারত বহির্বিশ্বের বাজারগুলি দখলে রাখতে ব্যর্থ হয় এবং এই বাজারগুলি ইউরোপীয় বণিকদের দখলে চলে যায়। ভারত শিল্পের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার ফলে এক অনুন্নত কৃষিভিত্তিক দেশে পরিণত হয়। **নবমত,** স্বাধীন শিল্প সংস্থা ও বণিক সংগঠনের অভাব ভারতীয় শিল্পের ও বাণিজ্যের অনগ্রসরতার অপর একটি কারণ। **দশমত,** আধুনিক যন্ত্রচালিত শিল্প গড়ে না ওঠার ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত শিল্পের কারিগর ও শিল্পীদের জীবিকা অর্জনের পথ বন্ধ হয়ে যায়। তাদের কাছে জীবিকা অর্জনের একমাত্র পথ ছিল কৃষি। লক্ষ লক্ষ কারিগর ও শিল্পী কৃষি-শ্রমিকে পরিণত হয়, ফলে কৃষির ওপর চাপ বৃদ্ধি পায়। ভারত তার সমৃদ্ধ শিল্প হারিয়ে কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত হয় এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিপর্যয় নেমে আসে।

অবশিল্পায়নের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি : ভারতের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত, দাদাভাই নওরোজী, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, রজনীপাম দত্ত, সারদা রাজু, নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ প্রমুখরা কোম্পানির ঔপনিবেশিক শাসন ও অবশিল্পায়নের

া করেছেন। স্যার থিওডোর মরিসন, ড্যানিয়েল থর্নার, মরিস ডেভিড মরিস প্রমুখ বিদেশি ঐতিহাসিকগণ 'অবশিল্পায়নের' তত্ত্ব তে রাজি নন। মার্কিন গবেষক মরিস ডেভিড মরিস মনে করেন যে, অবশিল্পায়নের ধারণা জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের অলীক না মাত্র। অপরপক্ষে, ডঃ বিপান চন্দ্র, ডঃ সব্যসাচী ভট্টাচার্য, ডঃ তপন রায়চৌধুরী, ডঃ অমিয় বাগচি প্রমুখের মতে অবশিল্পায়ন ক কল্পনা' বা 'myth' নয়, অবশিল্পায়ন একটি বাস্তব সত্য। অবশিল্পায়নের ফলে শিল্প ও ব্যবসা লোপ পাওয়ায় ভারতবাসী র দুর্দশার সম্মুখীন হয়। ভারতের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়।

.৪ ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তার ফলাফল (Land Revenue Experiments and Results)

● **দ্বৈত শাসন :** ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শোষণের ফলে প্রচলিত ভারতীয় অর্থনীতির ভিত্তি বিপর্যস্ত হয়েছিল। পূর্বতন রতীয় অর্থনীতির বিপর্যয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল নতুন রাজস্ব বন্দোবস্তের প্রবর্তন। বলা বাহুল্য, ভারতের কৃষি নীতির ক্ষেত্রে কোম্পানির শাসন যে পরিবর্তন এনেছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভূমিরাজস্ব হিসেবে সমস্ত কৃষি উদ্বৃত্ত আদায় া। বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের পর ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি বাংলা, বিহার, ওড়িশার দেওয়ানি অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ভ করেন। দেওয়ানি লাভের ফলে কোম্পানির সার্বভৌমত্বের ভিত্তি সুদৃঢ় হয় এবং কোম্পানি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে জনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। দেওয়ানি লাভ করার ফলে কোম্পানি বাংলার সকল ক্ষমতার উৎসে পরিণত হয়। নবাবের বাহ্যিকভাবে রাখা হলেও নবাবের হাতে প্রকৃত প্রশাসনিক ক্ষমতা কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। কোম্পানি তার মনোনীত কর্মচারী বাবের প্রশাসনে নিযুক্ত করার অধিকার লাভ করে। কোম্পানি এসময় নবাবপদ খারিজ করে সরাসরি বাংলার শাসন ক্ষমতা লাভ রতে পারত। কিন্তু সেক্ষেত্রে ফরাসি ও অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তিগুলির সঙ্গে কোম্পানির সংঘর্ষ দেখা দিত। শুধু তাই নয়, দেশীয় জাদের মনে ইংরেজদের সম্পর্কে ভীতির উদ্ভব হবার সম্ভাবনা ছিল। তাই সবদিক বিবেচনা করে কোম্পানি পরোক্ষভাবে বাংলার সন ক্ষমতা গ্রহণ করেই সন্তুষ্ট থাকে। রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রেও কোম্পানি পূর্ববর্তী মোগল ব্যবস্থাই বজায় রেখেছিল। কোম্পানির নিযুক্ত মহম্মদ রেজা খাঁ এবং সিতাব রায়ের উপর বাংলা, বিহার ও ওড়িশার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অর্পিত হয়। জস্ব আদায় করা ছাড়াও শুল্ক আদায় এবং ফৌজদারি ও দেওয়ানি মোকদ্দমার ভারও এদের উপর অর্পিত হয়। যদিও নায়েব বারা (রেজা খাঁ ও সীতাব রায়) আইনত নবাবের অধীন ছিলেন, তবুও প্রকৃতপক্ষে কোম্পানির স্বার্থরক্ষা করাই তাঁদের মুখ্য বেচ্য ও কর্তব্য ছিল। ক্লাইভ প্রবর্তিত এই অদ্ভুত ধরনের শাসনব্যবস্থা 'দ্বৈত শাসন' (Dual Government) নামে পরিচিত। দ্বৈত সনের অর্থ হল 'শাসন ক্ষমতা নিজামত ও কোম্পানির মধ্যে ভাগ হয়ে যাওয়া।' দেওয়ানি লাভের পর বাংলায় ইঙ্গ-মোগল থ শাসন প্রবর্তিত হয়। বাংলার শাসন পরিচালনার দায়িত্ব ছিল নবাবের উপর এবং রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার লাভ করে কোম্পানি। এক কথায় বাংলার নবাব হলেন ক্ষমতাহীন দায়িত্বের অধিকারী। অন্যদিকে কোম্পানী হল দায়িত্বহীন ক্ষমতার ধিকারী।

○ **দ্বৈত শাসনের কুফল :** দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। অচিরেই এর কুফল দেখা দিতে শুরু করে। আমিলদার' নামক দুর্নীতিগ্রস্ত রাজস্ব আদায়কারীদের অত্যাচারে বাংলার সাধারণ মানুষের দুর্দশা চরমে ওঠে। রাজস্ব আদায়কারী র্মচারীদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল যতদূর সম্ভব বেশি রাজস্ব আদায় করে কোম্পানি বাহাদুরকে সন্তুষ্ট রাখা। ফলে কৃষকদের ওপর ত্যাচার ও উৎপীড়ন প্রবল আকার ধারণ করে। সেই সঙ্গে কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীরাও বেনামিতে জমির ইজারা নিয়ে জাদের শোষণ শুরু করে। ইংরাজ ঐতিহাসিক কে (Keye)-র ভাষায়, ''দ্বৈত শাসন বিশৃঙ্খলাকে আরও জটিল করে তোলে এবং নীতিকে আরও গভীর করে তোলে''। কর্মচারীদের দুর্নীতি রোধ করার জন্য গভর্নর ভেরেলস্ট পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। কার্টিয়ারের ময় এই পরিদর্শকরাও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। দেওয়ানি লাভের পর থেকে বাংলার সম্পদ ইংল্যান্ডে চলে যেতে শুরু করে। বাংলায় কোম্পানি বাণিজ্যে ফুলে ফেঁপে ওঠায় ব্রিটিশ সরকার বড়ো ধরনের লভ্যাংশ দাবি করেন। একটি হিসাব থেকে জানা যায় যে কমাত্র ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা থেকে ৫·৭ মিলিয়ান পাউন্ডের মতো অর্থ ইংল্যান্ডে চলে যায়। বাংলার অর্থনীতির উপর এই ম্পদ নির্গমনের প্রভাব মারাত্মক হয়। দ্বৈত শাসন প্রবর্তিত হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ই দুর্ভিক্ষ ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' সোনার বাংলাকে শ্মশানে পরিণত রেছিল।

● **পাঁচশালা বন্দোবস্ত :** ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হন এবং বাংলার রাজস্ব-সংক্রান্ত রুত্বপূর্ণ সংস্কারে ব্রতী হন। গভর্নর নিযুক্ত হবার পর হেস্টিংস প্রথমেই দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা রদ করেন। তিনি বাংলা ও বিহারের

দুই নায়েব দেওয়ান রেজা খাঁ ও সিতাব রায়কে পদচ্যুত করে নায়েব সুবার পদ লোপ করেন। কোম্পানি নিজ হাতে রাজস্ব আদায়ের অধিকার গ্রহণ করেন। রাজস্ব আদায়ের জন্য জেলায় একজন পরিদর্শক (Supervisor) নিয়োগ করেন। এই পরিদর্শকেরা রাজস্ব নির্ধারণ ও তা আদায় করার ব্যাপারে ব্যর্থ হলে ডাইরেক্টর সভার নির্দেশে গভর্নর ও তার পরিষদকে নিয়ে রাজস্ব বোর্ড গঠন করা হয়। ... 'ভ্রাম্যমাণ কমিটি' (Committee of Circuit) নামে একটি পৃথক সংস্থা গঠন করেন (১৪ মে, ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দ)। এই ভ্রাম্যমাণ কমিটি গঠিত হয়েছিল গভর্নর ও তাঁর কাউন্সিলের চারজন সদস্যকে নিয়ে। এই কমিটির হাতে জমিদার ও তালুকদারদের সঙ্গে পাঁচ বছর মেয়াদে রাজস্ব বন্দোবস্ত করার দায়িত্ব অর্পিত হয়। যে জমিদার কোম্পানিকে সর্বোচ্চ কর দিতে রাজি হয়, তাকে পাঁচ বছরের জন্য জমির বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থা 'ইজারাদারি ব্যবস্থা' বা পাঁচশালা বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। কিন্তু পাঁচশালা বন্দোবস্ত জমিদারদের নিরাপত্তা বিপন্ন করে তুলেছিল। এইসময় জানা যায় যে, কোম্পানির বহু কর্মচারী বেনামিতে জমি বন্দোবস্ত গ্রহণ করে জমিদারদের নিরাপত্তা বিপন্ন করে তুলেছিল। ভ্রাম্যমাণ কমিটির এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় জমিদারদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করাও একপ্রকার অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। ... কোম্পানির কর্মচারীদের অধীনে চলে গিয়েছিল। যে বাংলা, বিহার, ওড়িশায় কোম্পানির নিজস্ব জমির প্রায় এক তৃতীয়াংশ কোম্পানির কর্মচারীদের অধীনে চলে গিয়েছিল।

● **রাজস্ব বোর্ড গঠন :** ওয়ারেন হেস্টিংস কোম্পানির কর্মচারীদের অসাধু কার্যকলাপ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে পাঁচশালা বন্দোবস্ত বাতিল করে এক বছর মেয়াদে জমি বন্দোবস্তের কথা চিন্তা করেন। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত নতুন পরিকল্পনায় রাজস্ব বোর্ডের দুজন সদস্য ও কোম্পানির তিনজন উর্ধ্বতন কর্মচারীকে নিয়ে কলকাতায় একটি রাজস্ব কমিটি গঠিত হয়। কলকাতায় ইউরোপীয় কালেক্টরের পদ তুলে দিয়ে প্রত্যেক জেলার রাজস্ব সংক্রান্ত দায়িত্ব একজন ভারতীয় দেওয়ানের হাতে ন্যস্ত করা হয়। কিন্তু কোম্পানির পরিচালক সভা এই ব্যবস্থা অনুমোদন না করায় হেস্টিংস কলকাতা কাউন্সিলের দুজন সদস্য ও তিনজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়ে গঠিত রাজস্ব বোর্ডের হাতে দেওয়ানি সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন। সামগ্রিকভাবে বাংলা, বিহার, ওড়িশাকে ছটি ডিভিসনে ভাগ করে প্রত্যেকটি ডিভিসনকে প্রাদেশিক কাউন্সিলের অধীনে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় দেওয়ানি কোশাগার স্থানান্তরিত করা হয়।

আমিনি কমিশন : পাঁচশালা বন্দোবস্ত ব্যর্থ হয়েছে উপলব্ধি করেই হেস্টিংস ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করার জন্য 'আমিনি কমিশন' নিয়োগ করেন। (১৭৭৬ খ্রিঃ)। ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে ফিলিপ ফ্রান্সিস নামক হেস্টিংস-এর কাউন্সিলের একজন সদস্য তাঁর বিখ্যাত স্মারকলিপি বা মিনিটে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। হেস্টিংস পাঁচশালা বন্দোবস্তের মেয়াদ শেষ হলে ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে একশালা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। একশালা বন্দোবস্ত অনুযায়ী—(১) ইজারাদারদের পরিবর্তে পুরাতন জমিদারদেরই জমি প্রতি বছর বন্দোবস্ত দেওয়ার নীতি গৃহীত হয়, (২) পরপর তিন বছরের রাজস্বের গড় নির্ধারণ করে সেইহারে একশালা বন্দোবস্তে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। (৩) ঠিকমত রাজস্ব প্রদানকারীকে পরের বছর জমি দেওয়ার কথা বলা হয়। (৪) প্রত্যেক জেলায় নিযুক্ত ইংরেজ কালেক্টরদের সহায়তা করার জন্য দেশীয় কানুনগো নিযুক্ত করা হয়। (৫) প্রদেয় রাজস্ব দিতে না পারলে জমিদারির একাংশ বিক্রি করে রাজস্ব পরিশোধ করার নিয়ম প্রবর্তিত হয়। বলা বাহুল্য একশালা বন্দোবস্তও ত্রুটিমুক্ত ছিল না। এই ব্যবস্থাও প্রজাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়নি। রমেশচন্দ্র দত্তের মতে, বার্ষিক বন্দোবস্ত, মাত্রাতিরিক্ত খাজনা বৃদ্ধি ও আদায় করার জন্য কঠোরতা ইত্যাদি কারণে বাংলার প্রাচীন জমিদারদের অধিকাংশই ধ্বংস হয়ে যায় এবং প্রাচীন পরিবারের বিপর্যয় ঘটে। এই প্রসঙ্গে বর্ধমান, দিনাজপুর ও রাজশাহির প্রাচীন জমিদার পরিবারের দুর্দশার উল্লেখ করেছেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ) :

● **ডাইরেক্টরি সভার অভিমত :** ওয়ারেন হেস্টিংসের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা তথা পাঁচশালা বন্দোবস্তের ফলে একদিকে যেমন কোম্পানির প্রাপ্য রাজস্ব বহুল পরিমাণে অনাদায়ী থেকে যায় তেমনি রায়ত-চাষিদের ওপর শোষণ বৃদ্ধি পায়। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে পিটের ভারত শাসন আইনে বলা হয় যে, অস্থায়ী বার্ষিক ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত ত্যাগ করে কোম্পানির একটি স্থায়ী ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা উচিত। তাছাড়া ওয়ারেন হেস্টিংস-এর কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিস ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের স্বপক্ষে প্রচার চালান। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে বিলাতের পরিচালকসভা একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনামা বা ডেসপ্যাচে বাংলায় স্থায়ী ভূমি-রাজস্ব প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। এতে আরও বলা হয় যে, স্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার জমিদারদের সঙ্গেই করা উচিত। জমিদারদের প্রদেয় রাজস্ব স্থায়ী হারে নির্ধারণ করে কোম্পানি যাতে ঠিকমতো রাজস্ব পেতে পারে তার জন্য সুনিশ্চিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। লর্ড কর্নওয়ালিশ ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল হিসেবে ভারতে আসেন। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ কর্নওয়ালিশকে বাংলায় স্থায়ী ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের নির্দেশ দেন। কর্তৃপক্ষ সভার বংশানুক্রমিক নীতির ওপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট হারে জমিদারদের সঙ্গে জমির বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করার সপক্ষে মত প্রকাশ করেন। ডাইরেক্টরি সভা এই

বন্দোবস্ত প্রথমে দশ বছরের জন্য ও পরে চিরস্থায়ী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ডাইরেক্টরি সভার নতুন পরিকল্পনা কার্যকর করার দায়িত্ব ছিল কর্নওয়ালিশের। ডঃ বিনয়ভূষণ চৌধুরী কর্নওয়ালিশের চিঠিপত্র, ডেসপ্যাচ ও স্মারকলিপির পর্যালোচনা করে মন্তব্য করেছেন যে, কর্নওয়ালিশ মনে করতেন যে, জমিদারদের জমিতে মালিকানা স্বত্ব ও স্থায়ী হারে রাজস্ব প্রবর্তন করলে, কৃষির উন্নতির জন্য জমিদাররা কৃষিতে মূলধন বিনিয়োগ করবে। কলকাতার ধনীরা জমিতে এই মূলধন বিনিয়োগ করে কৃষির উন্নতি ঘটাবেন। কৃষির উন্নতি হলে কোম্পানির বাণিজ্যও বাড়বে। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ ফেব্রুয়ারি বাংলা ও বিহার এবং ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে ওড়িশায় 'দশশালা বন্দোবস্ত' প্রবর্তিত হয়। কোম্পানির পরিচালক সভার অনুমোদনক্রমে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২২ মার্চ ''দশশালা বন্দোবস্ত'' চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হয়।

ফ্লাউড-কমিশনের প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, তদানীন্তন সময়ে বাংলার চারশ্রেণির জমিদারদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। মোগলদের কাছে উপঢৌকন হিসাবে বার্ষিক খাজনা দিতে বাধ্য আসাম, ত্রিপুরা ও কোচবিহারের অধিপতিগণ যারা প্রথম শ্রেণির অন্তর্গত ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণির অন্তর্গত ছিলেন বর্ধমান, রাজশাহি, ঢাকার প্রাচীন জমিদার পরিবার যারা বছরে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা সরকারকে দিতে বাধ্য ছিলেন, মোগল সরকার কর্তৃক নিযুক্ত রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীগণ যাদের পদ বংশানুক্রমিক হয়ে পড়েছিল তারা তৃতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত এবং দেওয়ানি লাভের পর কোম্পানি কর্তৃক নিযুক্ত এক শ্রেণির জোতদার যারা চতুর্থ শ্রেণির অন্তর্গত ছিল। ফ্লাউড কমিশনে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয় যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির জমিদারদের দাবির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তৃতীয় শ্রেণির জমিদারদের দাবি বিবেচনার কথা বলা হলেও চতুর্থ শ্রেণির জমিদারদের দাবি কখনও গ্রহণযোগ্য নয় বলে ফ্লাউড কমিশন ব্যক্ত করে।

বৈশিষ্ট্য : লর্ড কর্নওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কতগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। **প্রথমত,** এই ব্যবস্থা অনুসারেই স্থির হয় যে, নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে প্রদেয় খাজনা জমা দিলে জমিদার তালুকদারেরা বংশানুক্রমিকভাবে জমিদারি ভোগ করতে পারবেন। **দ্বিতীয়ত,** সূর্যাস্ত আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে খাজনা জমা না দিলে জমিদারগণ তাদের জমিদারি থেকে বঞ্চিত হবেন। **তৃতীয়ত,** জমিদারির খাজনা চিরস্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট করা হয়। **চতুর্থত,** নির্দিষ্ট খাজনা ছাড়া সরকার জমিদারদের কাছে কোনো অতিরিক্ত অর্থ দাবি করতে পারবে না। **পঞ্চমত,** জমিদার ও রায়তদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সরকার কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। রায়তকে জমিতে তার অধিকার লিপিবদ্ধ করে পাট্টা প্রদান করা হবে। পাট্টার শর্ত ভঙ্গ করা হলে রায়ত মামলা করতে পারবে। **ষষ্ঠত,** চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পূর্বে জমিদাররা যে বিচারের অধিকার ভোগ করত, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হলে জমিদারগণ সেই বিচার অধিকার থেকে বঞ্চিত হন।

সুফল : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল ছিল মিশ্র। এই ব্যবস্থার কয়েকটি সুফল ছিল। **প্রথমত,** চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কোম্পানি ভূমি-রাজস্ব থেকে বার্ষিক আয়ের নিশ্চয়তা লাভ করেছিল। **দ্বিতীয়ত,** রাজস্ব আদায়ের জন্য কোম্পানিকে আর বহু সংখ্যক কর্মচারী নিযুক্ত করার দরকার ছিল না, কারণ জমিদারগণ নিজেরাই খাজনা দিতেন। এর ফলে কোম্পানির ব্যয় হ্রাস পেয়েছিল। তৃতীয়ত, নির্দিষ্ট দিনে খাজনা জমা দিয়ে বংশানুক্রমিকভাবে জমিদারি ভোগ করার অধিকার জমিদারেরা লাভ করেন। **চতুর্থত,** অনিশ্চয়তার হাত থেকে মুক্তিলাভ করার ফলে জমিদারগণ প্রজাদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। **পঞ্চমত,** পাট্টার মাধ্যমে জমিতে রায়তের অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় জমিদারদের খুশিমতো জমি থেকে রায়ত উচ্ছেদের সম্ভাবনা দূর হয়েছিল। **ষষ্ঠত,** চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সমাজে একটি সমৃদ্ধশালী শ্রেণির সৃষ্টি হয়েছিল যাদের মাধ্যমে সুদূর গ্রামাঞ্চলে কোম্পানির প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল।

কুফল : চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ত্রুটিমুক্ত ছিল না। **প্রথমত,** চিরস্থায়ীভাবে খাজনা নির্দিষ্ট হওয়ায় ভবিষ্যতে ভূমি-রাজস্ব থেকে কোম্পানির রাজস্ব বৃদ্ধির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। **দ্বিতীয়ত,** সূর্যাস্ত আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করায় নির্দিষ্ট দিনে খাজনা জমা দিতে না পারায় অনেক জমিদার বংশ লুপ্ত হয়ে যায়। **তৃতীয়ত,** অনেক জমিদার জমিদারি পরিচালনার ভার নায়েব গোমস্তাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিজেরা শহরে বসবাস করার ফলে গ্রামগুলির উন্নতির পথ বন্ধ হয়ে যায়। **চতুর্থত,** নায়েব-গোমস্তাদের হাতে জমিদারি পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হওয়ায় তাদের অত্যাচারে প্রজারা নানাভাবে অত্যাচারিত হত। **পঞ্চমত,** চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হওয়ায় সম্পদশালী ব্যক্তিরা জমিদারিতে অর্থ বিনিয়োগ করার ফলে পরোক্ষভাবে ভারতের শিল্প বিকাশের পথে বাধার সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে ভারতের অর্থনীতি প্রধানত কৃষি নির্ভরই থেকে যায়। **ষষ্ঠত,** চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সমাজে একটি মধ্যস্বত্ব-ভোগী শ্রেণির সৃষ্টি হয়।

ভারতের সর্বত্র কোম্পানির রাজনৈতিক অধিকার একইসঙ্গে প্রতিষ্ঠা হয়নি বলে ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা একইসঙ্গে সর্বত্র কার্যকর করাও যায়নি। তাছাড়া ভারতের সর্বত্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি একই ধরনের ছিল না বলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সব

ব্যবস্থার প্রয়োগ করাও সম্ভব হয়নি। যেমন, মহীশূর এবং কর্ণাটক অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ বিগ্রহ চলার ফলে সেখানকার জমিদারদের সঙ্গে কোনো নিয়মের ফলে সেখানে ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যায়নি। দাক্ষিণাত্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিবর্তে **রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত** (১৮২০ খ্রি) প্রবর্তিত হয়েছিল।

● **রায়তওয়ারি ব্যবস্থা** : বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কোম্পানির পক্ষে লাভজনক না হওয়ায় কোম্পানি মাদ্রাজ, মহীশূর, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে প্রজাভিত্তিক **'রায়তওয়ারি ব্যবস্থা'** প্রবর্তন করে। ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ্ ডেভিড রিকার্ডো 'Principles of Political Economy' গ্রন্থে জমির ওপর কৃষকের প্রত্যক্ষ মালিকানার সুপারিশ করেন এবং জমির উন্নতির স্বার্থে জমিদারি প্রথা তুলে দিয়ে প্রজাভিত্তিক রাজস্ব ব্যবস্থার সমর্থন করেন। দক্ষিণ ভারতে (মাদ্রাজের একটি এলাকা বাদ দিয়ে) **'রায়তওয়ারি ব্যবস্থা'** প্রবর্তন করেন মাদ্রাজের গভর্নর টমাস মনরো (১৮২০–২৭ খ্রি) এবং ক্যাপ্টেন রীড।

বৈশিষ্ট্য : রায়তওয়ারি ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি হল—**প্রথমত**, এই ব্যবস্থায় ইংরেজ সরকার জমিদার, জায়গিরদার প্রভৃতি বাদ দিয়ে জমি সব রায়ত বা চাষিদের মধ্যে বিলি করে দিয়েছিল। **দ্বিতীয়ত**, রায়তওয়ারি ব্যবস্থায় ইংরেজ সরকার সরাসরি রাজস্ব আদায় করত। **তৃতীয়ত**, এই ব্যবস্থায় খাজনার পরিমাণ চিরস্থায়ী করা হয়নি। **চতুর্থত**, উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ থেকে এক তৃতীয়াংশ রাজস্বের বিনিময়ে সাধারণত ৩০ বছরের জন্য কৃষককে জমির বন্দোবস্ত দেওয়া হত। **পঞ্চমত**, জমির ওপর কৃষক রায়তের মালিকানা স্বত্ব ছিল না। শুধু ভোগ করার স্বত্ব ছিল। **ষষ্ঠত**, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য রাজস্ব মকুব করা হত না। **সপ্তমত**, রায়তকে রাজস্ব নগদ টাকায় প্রদান করতে হত। আপাতদৃষ্টিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তুলনায় রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত গণতান্ত্রিক মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবে তা ছিল উল্টো। প্রকৃতপক্ষে রায়তওয়ারি ব্যবস্থায় খাজনার পরিমাণ নির্দিষ্ট না থাকায় সরকার ক্রমাগত খাজনা বৃদ্ধি করার ফলে এখানকার কৃষকরা সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিল। 'Economic History of Bengal' গ্রন্থে নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিনহা দেখিয়েছেন যে, মহীশূরে টিপু সুলতান ও বাংলার মিরকাশিম রাজস্ব বৃদ্ধি করায় রায়তরা দুর্দশার মধ্যে পড়েছিল।

● **মহলওয়ারি ব্যবস্থা ও তার বৈশিষ্ট্য** : ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিবর্তিত সংস্করণ 'মহলওয়ারি' ব্যবস্থা মধ্য ভারতের কিছু অংশে, গাঙ্গেয় উপত্যকায় এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে প্রবর্তিত হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় জমিদার বা রায়তের সঙ্গে জমির বন্দোবস্ত না করে গ্রাম বা মহলের সঙ্গে করা হয়েছিল। মহলওয়ারি ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি হল—(১) কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি 'মহল' বা তালুক সৃষ্টির ভিত্তিতে সরকার ভূমি বন্দোবস্ত দিত। (২) রাজস্ব প্রদানের শর্তে এলাকার নির্ভরযোগ্য কোনো ব্যক্তি বা কয়েকজন ব্যক্তিকে মহলের ইজারা দেওয়া হত। (৩) এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার কৃষক মালিকানা সৃষ্টি করতে চাইলেও ভূস্বামীদের অস্তিত্ব মুছে ফেলা যায়নি। (৪) মহলওয়ারি ব্যবস্থায় কিছুদিন অন্তর অন্তর রাজস্ব বৃদ্ধি করা হত। (৫) এই ব্যবস্থার ফলে ক্ষুদ্র মালিকানার একটি দল গড়ে উঠেছিল। (৬) মহলওয়ারি ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায়কারীর প্রাপ্য ছিল ২০ শতাংশ এবং সরকার পেত ৮০ শতাংশ। মহলওয়ারি ব্যবস্থায় সরকার ও কৃষকের মধ্যে কোনো মধ্যস্বত্ব ভোগী না থাকায় প্রজারা তাদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পেলেও সরকারি কঠোরতার হাত থেকে মুক্তি পায়নি। ঠিকমতো রাজস্ব দিতে না পারার ফলে মহলওয়ারি অঞ্চলের বহু জমি হস্তান্তরিত হয়ে যায়।

● **ভাইয়াচারি বন্দোবস্ত** : গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রবর্তিত রাজস্ব ব্যবস্থার সামান্য পরিবর্তন করে তা পাঞ্জাবে প্রবর্তন করা হয়। যাদের ক্ষেত্রে যে কৃষক একাদিক্রমে বারো বছর জমি ভোগ করত, বার্ষিক নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে জমির উপর সেই কৃষকের বংশানুক্রমিক জমি ভোগ দখলের অধিকার স্বীকার করা হয়। এই ব্যবস্থা 'ভাইয়াচারি ব্যবস্থা' নামে পরিচিত। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রত্যেক চাষির ওপর পৃথক পৃথকভাবে রাজস্ব ধার্য করা হত। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তিত পাঞ্জাব প্রজাস্বত্ব আইন অনুসারে কৃষকের অধিকার আইন সিদ্ধ করা হয়। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে যুক্তপ্রদেশেও অনুরূপ প্রজাস্বত্ব আইন প্রবর্তিত হয়।

● **নতুন রাজস্ব ব্যবস্থার সামগ্রিক ফলাফল** : ইংরেজ সরকার প্রবর্তিত নতুন ভূমি ব্যবস্থার ফলে ভারতের প্রাচীন অর্থনৈতিক সম্পর্ক ভেঙে দিয়ে নতুন এক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। এই নতুন ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজ ও জীবনধারায় সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন এনেছিল। কোম্পানির আমলে ভারতে মোট তিন ধরনের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, মাদ্রাজ, মহীশূর ও মহারাষ্ট্রে ছিল 'রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত' এবং যুক্তপ্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবে ছিল মহলওয়ারি বন্দোবস্ত। রায়তওয়ারি ও মহলওয়ারি ব্যবস্থায় চিরস্থায়ীভাবে রাজস্ব নির্ধারিত হত না বলে ভবিষ্যতে ভূমি-রাজস্ব বৃদ্ধির সুযোগ কোম্পানির ছিল। বলা বাহুল্য, চিরস্থায়ী, রায়তওয়ারি ও মহলওয়ারি কোনো ব্যবস্থাতেই শোষণের হাত থেকে কৃষক মুক্ত ছিল না। কৃষকের কল্যাণ নয়, মাত্রাতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহের প্রয়োজনেই সরকার এই সমস্ত ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা

প্রবর্তন করেছিল। এই নতুন ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে স্যার জন শোর মন্তব্য করেছিলেন যে, কোম্পানি যেমন জমিদারদের সঙ্গে রাজস্বের ব্যাপারে একটা পাকাপাকি চুক্তি করছে, জমিদারদের প্রজাদের সঙ্গে সেইরকম চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু লর্ড কর্নওয়ালিশ জন শোরের কথা না মানার ফলে জমিদাররা চিরকাল রায়তদের উপর অত্যাচার করার সুযোগ পেয়ে যায়।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারগণ জমির মালিক হওয়ায় জমি বন্ধক বা বিক্রি করতে পারতেন। প্রজারা জমির মালিক ছিল না। জমিদাররা তাদের জমি থেকে উৎখাত করতে পারত। প্রজা বা কৃষকদের এই দুর্দশার জন্য দায়ী ছিল সরকারি আইন। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ১৭ নং রেগুলেশন এ্যাক্ট-এর ৯নং ধারায় বলা হয়েছিল যে, কৃষকের খাজনা বাকি থাকলে বকেয়া খাজনা আদায় করার জন্য বিচার বিভাগকে না জানিয়েই জমিদাররা কৃষকের ফসল বা অন্যান্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারবে। তবে বেআইনি জুলুমের বিরুদ্ধে কৃষক দেওয়ানি আদালতে নালিশ জানাতে পারবে। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে সপ্তম আইনে খাজনা আদায়ের ব্যাপারে কোম্পানি জমিদারদের সমস্ত রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান করে। সিরাজুল ইসলাম সপ্তম আইনকে, "ব্রিটিশ শাসনের প্রথম কালা কানুন" বলেছেন। ঐতিহাসিক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিন্‌হার ভাষায় সপ্তম আইন ছিল 'It gave a blank cheque to the Zamindar". ডঃ এন. কে. সিনহার এই মন্তব্যটি সুগত বসু তাঁর গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করেছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার ইচ্ছা করলে যে-কোনো সময় প্রজাকে জমি থেকে উৎখাত করতে বা রাজস্ব আদায়ের জন্য অত্যাচার করতে পারত। রমেশ চন্দ্র দত্ত বাংলার কৃষকদের দুরবস্থার জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে দায়ী করেছেন। রায়তওয়ারি ব্যবস্থায় জমিদার না থাকলেও কোম্পানি ও তার কর্মচারীরাই জমিদারদের স্থান গ্রহণ করেছিল। মহলওয়ারি ব্যবস্থায় মহলের প্রভাবশালী লোকেরা একই ধরনের ক্ষমতা ভোগ করতেন। সুতরাং, দেখা যায় চিরস্থায়ী, রায়তওয়ারি ও মহলওয়ারি ব্যবস্থায় কৃষকদের অবস্থা ছিল সমান।

● **মহাজন শ্রেণির উদ্ভব :** চিরস্থায়ী ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল না হলে বা নষ্ট হলে অনেক সময় জমিদাররা খাজনা মুকুব করলেও রায়তওয়ারি বা মহলওয়ারি ব্যবস্থায় যে সুযোগ ছিল না। রায়তওয়ারি ব্যবস্থায় রাজস্বের হার ছিল উৎপন্ন ফসলের ৪৫ থেকে ৫৫ ভাগ। শস্যহানি হলেও খাজনা দিতে হত। শুধু মাত্রাতিরিক্ত রাজস্বই নয়, নানা অবৈধ করও কৃষকদের দিতে হতো যা দেবার সামর্থ তাদের ছিল না। কোম্পানির শাসকেরা প্রথম থেকেই ফসলের মাধ্যমে রাজস্ব দেবার পদ্ধতি বাতিল করে নগদ টাকায় নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দেবার নিয়ম চালু করে। ফসল বিক্রি করে প্রজারা সরকারকে রাজস্ব মেটাত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অজন্মা ইত্যাদি কারণে শস্যহানি ঘটলে সরকারের রাজস্ব দেবার জন্য প্রজারা ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হত। কৃষকদের ঋণ দেবার জন্য গ্রামাঞ্চলে নতুন 'মহাজন' শ্রেণি সৃষ্টি হয় যারা কৃষকদের চড়া সুদে ঋণ দিত। ঋণ শোধ করতে না পারলে ঋণগ্রস্ত কৃষকের জমি মহাজনের হাতে চলে যেত। গ্রামীণ সমাজে মহাজন শ্রেণির উদ্ভবের ফলে কৃষকরা ক্রমশ ঋণগ্রস্ত হয়ে জমি হারাতে বাধ্য হত। এইভাবে ঋণগ্রস্ত কৃষকরা পরিণত হয় ক্ষেত মজুর বা ভাগচাষিতে। সমাজে এর প্রতিক্রিয়ায় বিক্ষোভ দেখা দিতে থাকে। কোম্পানি নিজেদের ভুল সংশোধন করার জন্য ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রজাদের স্বার্থে আইন পাশ করে। কিন্তু এই আইন প্রবর্তনের পরও অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। বাংলায় একের পর এক কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিতে শুরু করে। ফলে একপ্রকার বাধ্য হয়েই সরকার ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় প্রজাসত্ব আইন পাশ করে। সুতরাং দেখা যায় যে, নতুন ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা কৃষকের জীবনে দরিদ্রতা ও শোষণই বৃদ্ধি করেছিল, নতুন ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় জমির ওপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং কোম্পানির রাজস্ব আয়ও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকার বা জমিদার কেউই জমির উন্নতি সাধনে আগ্রহী ছিলেন না। এর ফলে জমির উৎপাদন ক্ষমতা কমে গিয়ে ফসলের পরিমাণ হ্রাস পেতে শুরু করেছিল। দেশের অধিকাংশ কৃষক দুবেলা খেতে পেত না। রমেশচন্দ্র দত্ত ইংরেজদের শোষণনীতিকে ভারতীয়দের দারিদ্র্যের জন্য দায়ী করেছেন।

27.9 ভারতীয় অর্থনীতির উপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব (Economic impact of the First World War in India) :

বিশ্ব তথা মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভারতবর্ষের ইতিহাসেও মহাযুদ্ধের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে মহাযুদ্ধের ফলে ভারতীয় সমাজ, অর্থনীতি, প্রশাসন, রাজনীতি নতুন খাতে বইতে শুরু করে। ডঃ সুমিত সরকার মন্তব্য করেছেন যে, "মহাযুদ্ধ ও তার পরের বছরগুলিতে ভারতীয়দের জীবনে দেখা দিয়েছিল গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। এই পরিবর্তনগুলি হল : মন্টেগু চেমসফোর্ডের প্রতিবেদন ও ভারত সরকার আইন, ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধিজির উত্থান এবং ভারতীয় ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ দিক পরিবর্তন।

প্রবর্তন করেছিল। এই নতুন ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে **স্যার জন শোর** মন্তব্য করেছিলেন যে, কোম্পানি যেমন জমিদারদের সঙ্গে রাজস্বের ব্যাপারে একটা পাকাপাকি চুক্তি করছে, জমিদারদের প্রজাদের সঙ্গে সেইরকম চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু লর্ড কর্নওয়ালিশ জন শোরের কথা না মানার ফলে জমিদাররা চিরকাল রায়তদের উপর অত্যাচার করার সুযোগ পেয়ে যায়।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারগণ জমির মালিক হওয়ায় জমি বন্ধক বা বিক্রি করতে পারতেন। প্রজারা জমির মালিক ছিল না। জমিদাররা তাদের জমি থেকে উৎখাত করতে পারত। প্রজা বা কৃষকদের এই দুর্দশার জন্য দায়ী ছিল সরকারি আইন। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ১৭ নং রেগুলেশন এ্যাক্ট-এর ৯নং ধারায় বলা হয়েছিল যে, কৃষকের খাজনা বাকি থাকলে বকেয়া খাজনা আদায় করার জন্য বিচার বিভাগকে না জানিয়েই জমিদাররা কৃষকের ফসল বা অন্যান্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারবে। তবে বেআইনি জুলুমের বিরুদ্ধে কৃষক দেওয়ানি আদালতে নালিশ জানাতে পারবে। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে সপ্তম আইনে খাজনা আদায়ের ব্যাপারে কোম্পানি জমিদারদের সমস্ত রকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দান করে। **সিরাজুল ইসলাম** সপ্তম আইনকে, "ব্রিটিশ শাসনের প্রথম কালা কানুন" বলেছেন। ঐতিহাসিক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিনহার ভাষায় সপ্তম আইন ছিল 'It gave a blank cheque to the Zamindar". ডঃ এন. কে. সিনহার এই মন্তব্যটি সুগত বসু তাঁর গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করেছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার ইচ্ছা করলে যে-কোনো সময় প্রজাকে জমি থেকে উৎখাত করতে বা রাজস্ব আদায়ের জন্য অত্যাচার করতে পারত। রমেশ চন্দ্র দত্ত বাংলার কৃষকদের দুরবস্থার জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে দায়ী করেছেন। রায়তওয়ারি ব্যবস্থায় জমিদার না থাকলেও কোম্পানি ও তার কর্মচারীরাই জমিদারদের স্থান গ্রহণ করেছিল। মহলওয়ারি ব্যবস্থায় মহলের প্রভাবশালী লোকেরা একই ধরনের ক্ষমতা ভোগ করতেন। সুতরাং, দেখা যায় চিরস্থায়ী, রায়তওয়ারি ও মহলওয়ারি ব্যবস্থায় কৃষকদের অবস্থা ছিল সমান।

● **মহাজন শ্রেণির উদ্ভব :** চিরস্থায়ী ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসল না হলে বা নষ্ট হলে অনেক সময় জমিদাররা খাজনা মুকুব করলেও রায়তওয়ারি বা মহলওয়ারি ব্যবস্থায় যে সুযোগ ছিল না। রায়তওয়ারি ব্যবস্থায় রাজস্বের হার ছিল উৎপন্ন ফসলের ৪৫ থেকে ৫৫ ভাগ। শস্যহানি হলেও খাজনা দিতে হত। শুধু মাত্রাতিরিক্ত রাজস্বই নয়, নানা অবৈধ করও কৃষকদের দিতে হতো যা দেবার সামর্থ তাদের ছিল না। কোম্পানির শাসকেরা প্রথম থেকেই ফসলের মাধ্যমে রাজস্ব দেবার পদ্ধতি বাতিল করে নগদ টাকায় নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দেবার নিয়ম চালু করে। ফসল বিক্রি করে প্রজারা সরকারকে রাজস্ব মেটাত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অজন্মা ইত্যাদি কারণে শস্যহানি ঘটলে সরকারের রাজস্ব দেবার জন্য প্রজারা ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হত। কৃষকদের ঋণ দেবার জন্য গ্রামাঞ্চলে নতুন 'মহাজন' শ্রেণি সৃষ্টি হয় যারা কৃষকদের চড়া সুদে ঋণ দিত। ঋণ শোধ করতে না পারলে ঋণগ্রস্ত কৃষকের জমি মহাজনের হাতে চলে যেত। গ্রামীণ সমাজে মহাজন শ্রেণির উদ্ভবের ফলে কৃষকরা ক্রমশ ঋণগ্রস্ত হয়ে জমি হারাতে বাধ্য হত। এইভাবে ঋণগ্রস্ত কৃষকরা পরিণত হয় ক্ষেত মজুর বা ভাগচাষিতে। সমাজে এর প্রতিক্রিয়ায় বিক্ষোভ দেখা দিতে থাকে। কোম্পানি নিজেদের ভুল সংশোধন করার জন্য ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রজাদের স্বার্থে আইন পাশ করে। কিন্তু এই আইন প্রবর্তনের পরও অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। বাংলায় একের পর এক কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিতে শুরু করে। ফলে একপ্রকার বাধ্য হয়েই সরকার ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় প্রজাসত্ব আইন পাশ করে। সুতরাং দেখা যায় যে, নতুন ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা কৃষকের জীবনে দরিদ্রতা ও শোষণই বৃদ্ধি করেছিল, নতুন ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় জমির ওপর ব্যক্তিগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং কোম্পানির রাজস্ব আয়ও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকার বা জমিদার কেউই জমির উন্নতি সাধনে আগ্রহী ছিলেন না। এর ফলে জমির উৎপাদন ক্ষমতা কমে গিয়ে ফসলের পরিমাণ হ্রাস পেতে শুরু করেছিল। দেশের অধিকাংশ কৃষক দুবেলা খেতে পেত না। রমেশচন্দ্র দত্ত ইংরেজদের শোষণনীতিকে ভারতীয়দের দারিদ্র্যের জন্য দায়ী করেছেন।

27.9 ভারতীয় অর্থনীতির উপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব (Economic impact of the First World War in India) :

বিশ্ব তথা মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভারতবর্ষের ইতিহাসেও মহাযুদ্ধের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে মহাযুদ্ধের ফলে ভারতীয় সমাজ, অর্থনীতি, প্রশাসন, রাজনীতি নতুন খাতে বইতে শুরু করে। ডঃ সুমিত সরকার মন্তব্য করেছেন যে, "মহাযুদ্ধ ও তার পরের বছরগুলিতে ভারতীয়দের জীবনে দেখা দিয়েছিল গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। এই পরিবর্তনগুলি হল : মন্টেগু চেমসফোর্ডের প্রতিবেদন ও ভারত সরকার আইন, ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধিজির উত্থান এবং ভারতীয় ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ দিক পরিবর্তন।

ভারতীয় অর্থনীতির ওপর মহাযুদ্ধের সুদূরপ্রসারী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বযুদ্ধের সময় একদিকে যেমন রপ্তানি হ্রাস পেয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি ভারতীয় কৃষি ও শিল্পের অর্থনীতি, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, সংকটের কর বৃদ্ধি, বেকার সমস্যা, বিশ্বযুদ্ধ শেষে অর্থনীতে ভারতীয় টেকনিকের অসম্প্রসারণ এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক শোষণের যে অবস্থা ভারতবাসী বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য করেছিল তা আর্থিক ক্ষেত্রে ভারতীয়দের সঙ্গে ব্রিটিশের দ্বন্দ্ব সংঘাত পরিণামে প্রকটীত হয়ে উঠেছিল। মহাযুদ্ধের প্রয়োজন মেটাতে বিপুল পরিমাণে অর্থব্যয় করায় ভারতের আর্থিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন বৃদ্ধি পেয়েছিল যা ভারতবাসীকেই বহন করতে হয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে উৎপাদনে হ্রাসবৃদ্ধি দেখা যায়। এই সময় একদিকে যেমন যুদ্ধের প্রয়োজনে শিল্পজাত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছিল অন্যদিকে তেমনি উৎপাদক ক্ষেত্রে শিল্প সংকটের আশঙ্কা হ্রাস পাওয়ায় শিল্পস্তরের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কারণ যুদ্ধের সময় ব্রিটেনের কলকারখানাগুলি যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এছাড়া যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারত সরকারও ভারতে উপর শিল্পকাটতি নিয়ন্ত্রণে বাধ্য হয়। ফলে ভারতে শিল্পজাত দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি পায়। তবে শিল্পজাত দ্রব্যাদির মূল্য অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেলেও ভারতে কৃষিজাত পণ্যাদির মূল্য আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতীয় কৃষকদের প্রকৃত সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন—লবণ, কেরোসিন, কাপড়, ঔষধ, বাসনা ইত্যাদি পণ্যের দাম অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পায়। সামরিক সমাজের অবস্থা সংকটময় হয়ে ওঠে। অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ দাদাভাই নৌরোজেন তে, ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে মুদ্রাস্ফীতির অতিরিক্ত গড় আয় ৪০ টাকা এবং ব্যয় ছিল ৪৭ টাকা, আনা। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে সেই ব্যয় বেড়ে দাঁড়ায় ৭৮ টাকা ৬ পাই। এর ফলে সাধারণ মানুষ ও কৃষক-শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে ভারতীয় অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়ে। যুদ্ধখাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় জাতীয় আয়ের পরিমাণ ৬৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ভারতবাসীর উপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপানো হয়। ধনী-নির্ধন সকলেরই মূল্য কর দিতে বাধ্য হয়। এছাড়া আয়করের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে অর্থনিত মানুষকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলা হয়। তুলি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও এই সময় ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ব্যবহারযোগ্য এলাকায় ৬০ বছর অন্তর কর পাওয়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয় এবং প্রতিটি এলাকার নাম করণের উপকরণ বানানো হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে ধরা হলে সাধারণ মানুষের অবস্থা বুঝিতে হয় ওঠে। এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্রমে থাকা অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায় পরিশেষে পরিস্থিতির আয়ত্তে আনে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিদেশি পণ্যের আমদানি হ্রাস, পুঁজিবাজার বৃদ্ধি, শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি ইত্যাদি নানা কারণে ভারতীয় শিল্পপতিরা নিজেদের শক্তিশালী করেছিলেন কারণ সেই সময় ইংলন্ডজাতীয় পণ্যের আমদানি হ্রাস পাওয়ায় ভারতীয় অর্থনীতি আভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণ সুযোগ পায়। শিল্পপতিরা উৎপাদন বৃদ্ধি করে আর্থিকভাবে মূলধন অর্জন করে। যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্রিটিশ সরকারও ভারতীয় শিল্পপতিদের প্রতি সহানুভূতিমূলক নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার পরই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ইংলন্ডজাতীয় শিল্প দ্রব্যাদি পুনরায় ভারতে আসতে থাকলে ভারতীয় শিল্পজাতের বিক্রি কমে যায় এবং এই সময় বিক্রয় মূল্য হ্রাস পায়। ফলে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্রিটিশ সরকারের এই নিজস্ব মূলক নীতি ভারতীয় বণিকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করে।

বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ভারতীয় শিল্পের উন্নতি পরিলক্ষিত হলেও ভারতীয় পুঁজিবাজার অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। ব্যবহারের দাম ও অবস্থার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেলেও পুঁজিবাজার মাত্র ১৪ শতাংশও বৃদ্ধি পায়নি। এই অবস্থার মূল কারণ হিসেবে ভারতীয় শিল্পের অধিকাংশ ব্যক্তিগত পুঁজির ওপর নির্ভরশীল থাকা এবং পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের অভাব। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের মূল বিপ্লব ব্যবসায়ের পুঁজিবাজার মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করে। অবশ্য পুঁজির শ্রেণির অর্থনৈতিক ক্ষমতা পড়ে থাকে একদিকে পুঁজির সংগঠন। পুঁজির শ্রেণির অন্যান্য পুঁজির শ্রেণিকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা অনেক পরিণত করে।